

জাতীয়

শেখ মুজিব হত্যার আগে কেমন ছিল বাংলাদেশ

প্রতিবেদক: বিবিসি বাংলা

প্রকাশের তারিখ: শনিবার, ১৫ আগস্ট ২০২৬, ০৫:০০ PM



শেখ মুজিবুর রহমান। ছবি: বিবিসি বাংলা

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সংঘটিত ওই অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

অভ্যুত্থানের আগে কয়েক সপ্তাহ দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলাজনিত অস্থিরতা চলছিল। বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। গঠন করা হয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ-বাকশাল। চারটি ছাড়া অন্য সব সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এর পাশাপাশি দুর্নীতি, লুটপাট, চোরাচালান, চুরি ও ডাকাতির ঘটনা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছিল। দল নিষিদ্ধ এবং নেতাকর্মীদের বিনা বিচারে হত্যা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে চরমপন্থি বিভিন্ন সংগঠনও সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছিল।

এরই মধ্যে শেখ মুজিবের ওপর এক দফা হামলার ঘটনাও ঘটে। ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস তখন বিষয়টি ওয়াশিংটনকে জানিয়েছিল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদের মতে, সব মিলিয়ে তখন দেশে ংদম বন্ধ হওয়ার মতো ং অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

তার ভাষায়, বাকশালের কারণে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ওই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার সুযোগ কমে গিয়েছিল। এ কারণেই হয়তো সেনাবাহিনীর একটি অংশ অভ্যুত্থানের পথ বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু শেখ মুজিব হত্যার আগের কয়েক সপ্তাহে দেশে কী ঘটছিল?

স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিবের সরকার তা নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছিল।

১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ শুরুর পর দুর্নীতি ও লুটপাট আরো বেড়ে যায় বলে বিভিন্ন স্মৃতিকথা ও সে সময়ের সংবাদপত্রের খবরে উঠে এসেছে।

অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হামিদ তার ংতিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা ং বইয়ে লিখেছেন, ত্রাণের সামগ্রীও অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছিল না। গম, চাল ও কম্বল চুরির ঘটনা ঘটছিল।

দুর্নীতি, লুটপাট ও চোরাচালান বন্ধ করতে একপর্যায়ে সরকার সেনাবাহিনীকে মাঠে নামায়। সেনাসদস্যরা কাজ করতে গিয়ে দেখেন, এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী জড়িত।

এম এ হামিদের ভাষ্য অনুযায়ী, এ সময় তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার বিরোধ তৈরি হয়। দলীয় নেতারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের কাছে অভিযোগ করতে থাকেন।

একপর্যায়ে সরকারের সিদ্ধান্তে সেনাসদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এতে সেনাসদস্য ও সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয় যে, শেখ মুজিব তার দলের নেতাকর্মীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ না করে বরং প্রশ্রয় দিচ্ছেন ং বলছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ।

এরপর দুর্নীতি ও লুটপাট আরো বেড়ে যায়।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে খাদ্যশস্য লুটের কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হয়। ঘটনাটিকে ং হরির লুট ং হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, গুদাম থেকে খাদ্যশস্য পাচারের ঘটনা অনেক দিন ধরেই চলছিল।

এর কিছুদিন পর প্রকাশিত আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি গুদাম থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানোর সময় এক-চতুর্থাংশ খাদ্যশস্য ং রহস্যজনকভাবে উধাও ং হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে খাদ্যশস্য পাঠানোর কারণে পথে ট্রেনের বগি ভেঙে ব্যাপকভাবে খাদ্য পাচার করা হচ্ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

১০ আগস্ট দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ং সমাজের সর্বস্তর আজ দুর্নীতির বিষদাঁতে বিদ্ধ ং। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারকে দেওয়া ২৭১টি চেকও গায়েব করে ফেলার অভিযোগ তোলা হয় সেখানে।

আইনশৃঙ্খলার অবনতি

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ক্রমে খারাপ হতে থাকে।

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় প্রায় প্রতিদিন চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও হত্যার ঘটনা ঘটছিল। বাড়িঘরে চুরি-ডাকাতির পাশাপাশি ট্রেন ও লঞ্চেও নিয়মিত ডাকাতির খবর প্রকাশিত হতো।

১৯৭৫ সালের ১১ আগস্ট দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় একটি ট্রেন ডাকাতির খবর। “দুর্ধর্ষ ট্রেন ডাকাতি” শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, আগের রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদীগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে ডাকাতি হয়।

ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে তারা শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে দুই যাত্রী নিহত এবং অন্তত ২২ জন আহত হন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান

১৯৭৫ সালের শুরুতে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির শীর্ষ নেতা সিরাজ শিকদারকে পুলিশ হত্যা করে।

এর প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনটির নেতাকর্মীরা সহিংস তৎপরতা বাড়িয়ে দেন। তৎকালীন সরকারও বলেছিল, এসব কর্মকাণ্ডের কারণে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বহারা পার্টিসহ বিভিন্ন চরমপন্থী সংগঠনের বিরুদ্ধে পুলিশ ও রক্ষী বাহিনীর অভিযান জোরদার করা হয়।

তখনকার সংবাদপত্রে এসব অভিযানের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হতো। গ্রেপ্তার ও অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি সরকারি বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে চরমপন্থী নেতাকর্মীদের নিহত হওয়ার খবরও আসত। সরকারি বাহিনীর সদস্যদের হতাহতের খবর তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যেত।

১৩ আগস্ট, অর্থাৎ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার দুই দিন আগে, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, “চারজন চরমপন্থী নিহত, একজন গ্রেফতার”।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অভিযান চালানোর সময় চরমপন্থীরা রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। রক্ষী বাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। এতে চরমপন্থী সংগঠনের চার সদস্য ঘটনাস্থলে নিহত হন। আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যরা পালিয়ে যান।

প্রথমে খরা, পরে বন্যা

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের প্রভাব তখনো পুরোপুরি কাটেনি। খাদ্যসংকট মোকাবিলায় সরকার কৃষকদের আউশ মৌসুমে বেশি জমিতে ধান চাষের আহ্বান জানায়।

অনেক কৃষক এতে সাড়াও দেন। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা দেয় খরা।

৯ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, “পানির অভাবে আউশ ধানের গাছ শুকাইয়া যাইতেছে”।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্ষা মৌসুমেও দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়া এবং সেচের অভাবে কুমিল্লা, নেত্রকোনা, কালীগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আউশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছিল। ধানের গাছ শুকিয়ে যাওয়ায় কৃষকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

এর প্রায় দেড় সপ্তাহ পর খরার পর শুরু হয় টানা বৃষ্টি।

অতিবৃষ্টি এবং উজান থেকে ভারতের পাহাড়ি ঢলে সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুরের অনেক এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। এতে আউশের ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে।

বন্যাকবলিত এলাকায় ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। একই সঙ্গে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটও তীব্র হয়।

সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ

সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের স্মৃতিকথায় সে সময় সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা ও অসন্তোষের বিভিন্ন কারণ উঠে এসেছে।

দলীয় নেতাদের চাপের মুখে সেনাসদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের অনেকে ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেনাবাহিনীর একটি অংশ শেখ মুজিবের একদলীয় শাসনব্যবস্থাও মেনে নিতে পারছিল না।

এম এ হামিদ তার বইয়ে লিখেছেন, এ সময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হতে থাকেন।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যেও পদ ও পদবি নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়।

এর পাশাপাশি রক্ষী বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা নিয়েও সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ছিল। এ নিয়ে একটি গুজব পরিস্থিতিতে আরো উত্তপ্ত করে তোলে।

এম এ হামিদের বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী, সেনানিবাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে শেখ মুজিব সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে ভারতের সহযোগিতায় রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলছেন। আধুনিক অস্ত্র, নতুন ব্যারাক, গাড়ি ও ইউনিফর্ম দেওয়ার কারণে সেনাবাহিনীর সন্দেহ আরো বাড়ে।

বিভিন্ন কারণে তরুণ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত ও জোরপূর্বক অবসর দেওয়ার ঘটনাও অসন্তোষ বাড়িয়ে দেয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

দুর্নীতিরোধে অভিযান

বিশ্লেষকদের মতে, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি শেখ মুজিব নিজেও একপর্যায়ে বুঝতে পারেন। এর প্রভাব সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনেও পড়ছিল।

দুর্নীতি ও চোরাচালান বন্ধে সরকার কয়েক দফা অভিযান চালায়। সর্বশেষ অভিযানটি শেখ মুজিব শুরু করেন নিহত হওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে।

জুলাইয়ের শেষভাগে শুরু হওয়া ওই অভিযান মূলত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। সে সময়ের পত্রপত্রিকায় তাদের সাময়িক বরখাস্ত ও গ্রেপ্তারের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

১ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, [সাত লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ৩ জন গ্রেফতার]।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যাংকের ভুয়া রসিদ ব্যবহার করে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তিন কর্মকর্তা সরকারি প্রায় ৭ লাখ ২৭ হাজার টাকা সমমূল্যের সিমেন্ট তুলে বিক্রি করেন। পরে ওই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন সংস্থা তাদের গ্রেপ্তার করে।

দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিমন্ত্রী বরখাস্ত

১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

এরপর জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে তাকে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ওই সময়ের সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সরকার ও প্রশাসনের দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের সতর্ক করা এবং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যেই তাকে বরখাস্ত করা হয়।

২১ জুলাই শেখ মুজিবুর রহমান নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তাকে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরে চিঠিটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ৫৮(৫) ধারার আওতায় তাকে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

সাময়িক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাত এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমানের নাম উঠে আসে।

তৎকালীন প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টের এই কর্মকর্তা বেশ কিছু সময় ধরে পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৫ আগস্টের কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি অন্য কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

প্রশ্ন ওঠে, সেনাবাহিনীর একজন জুনিয়র কর্মকর্তা এবং মুক্তিযোদ্ধা মেজর ফারুক কেন শেখ মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন?

এম এ হামিদের বইয়ের বর্ণনায়, দেশের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার অপব্যবহার, খুন ও হাইজ্যাকিং দেখে ফারুক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

তার মধ্যে এমন ধারণাও তৈরি হয়েছিল যে, দেশ ভারতের ওপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তিনি মনে করতেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশকে ভারতের [সেবাদাস] বানিয়ে ফেলছেন।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা মেজর ফারুক প্রথমে জানান মেজর খন্দকার আব্দুর রশিদকে। তারা সম্পর্কে ভায়রা ভাই ছিলেন।

এম এ হামিদের বই অনুযায়ী, ১২ আগস্ট রাতে আলোচনা করে তারা ১৫ আগস্টকে অভ্যুত্থান বাস্তবায়নের দিন হিসেবে বেছে নেন।

মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক

মেজর ফারুক ও মেজর রশিদের যোগাযোগ হয় সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত ও জোরপূর্বক অবসর দেওয়া কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে।

তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর শরীফুল হক ডালিম, নূর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী, আজিজ পাশা ও সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান।

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাও পরে অভ্যুত্থানে অংশ নেন।

পরিকল্পনাকারী কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষ নেতার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করা হয়।

তবে তাদের কাছ থেকে কেবল খন্দকার মোশতাক আহমেদই ইতিবাচক সাড়া দেন বলে বর্ণনায় উঠে এসেছে।

এম এ হামিদের বই অনুযায়ী, ২ আগস্ট মেজর রশিদ খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন। দুজনের বাড়িই কুমিল্লা এলাকায় ছিল।

বইয়ে বলা হয়েছে, শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে মোশতাক সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছিলেন।

পরিকল্পনা ছিল, শেখ মুজিবকে উৎখাত ও হত্যার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন এবং রাজনৈতিক চাপ সামলাবেন।

শেষ মুহূর্তের ঝরকি

১৫ আগস্টের চূড়ান্ত অভিযানের আগের দিন শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন ও আশপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করে আসেন অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা।

শেখ মুজিব হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী সুবেদার গণি তদন্ত কর্মকর্তাদের জানান, ১৪ আগস্ট বিকেলে মেজর ডালিমকে মোটরসাইকেলে করে শেখ মুজিবের বাসভবনের সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন তিনি।

ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাকেও সেদিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় দেখা যায় বলে তদন্তে উঠে আসে।

এম এ হামিদের বইয়ে বলা হয়েছে, সেনানিবাসের টেনিস কোর্টেও মেজর ডালিমসহ চাকরিচ্যুত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে দেখা গিয়েছিল।

এরপর নিয়মিত মহড়ার কথা বলে অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা রাতে ট্যাংক, অস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে একত্র হন। তাদের প্রত্যেককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর ১৫ আগস্ট ভোরে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

ধানমন্ডি ৩২ নয়, নিরাপত্তা জোরদার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৫ আগস্ট ভোররাতে শেখ মুজিবকে হত্যার জন্য অভ্যুত্থানকারী সেনারা যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে যান, তখন তাদের প্রতিহত করার মতো শক্তিশালী নিরাপত্তাব্যবস্থা সেখানে ছিল না বলে পরে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উঠে আসে।

বরং ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল। কারণ ১৫ আগস্ট সকালে সেখানে যাওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও প্রস্তুতি শেষ করেছিল।

এর মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। কারা এসব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, তা জানা যায়নি।

তবে বিস্ফোরণের পর পুলিশসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি সেখানে আরো বাড়ানো হয়।

অন্যদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসভবন ছিল অনেকটাই অরক্ষিত। পরে তদন্তে উঠে আসে, সেখানে দায়িত্ব পালনকারী নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদও ছিল না।

আগেও হামলা হয়েছিল

১৯৭৫ সালের আগস্টের আগেও শেখ মুজিবের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তবে বিষয়টি তখন প্রকাশ্যে আসেনি।

ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস গোপন তারবার্তার মাধ্যমে হামলার বিষয়টি ওয়াশিংটনকে জানিয়েছিল।

সেখানে বলা হয়, ২১ মে ১৯৭৫ বিকেলে শেখ মুজিবের ওপর হামলা হয়। তিনি অক্ষত থাকলেও ওই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় দুজন আহত হন।

টেলিভিশন স্টেশন পরিদর্শন শেষে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল, মার্কিন তারবার্তায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

শেখ মুজিবের নিরাপত্তায় নিয়োজিত একজন পুলিশ কর্মকর্তা মার্কিন দূতাবাসের এক কর্মকর্তাকে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন বলে ওই বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

তবে সরকারি সিদ্ধান্তে হামলার খবর জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। তথ্য অধিদপ্তর খবরটি প্রকাশ না করার জন্য সংবাদপত্রগুলোকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছিল বলেও মার্কিন গোপন বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

এসব ঘটনার মধ্যেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হন।

সূত্র: বিবিসি

এ বিভাগের আরও খবর



গ্যাস-সংকট কাটাতে ২ বছর সময় লাগবে: বাণিজ্যমন্ত্রী

গ্যাস সংকটের কারণে শিল্প-কারখানায় যে দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে, তা দীর্ঘদিনের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্যা বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দোজ আলী...



ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব: আইনমন্ত্রী

ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা মানবাধিকার নিশ্চিত করারই অংশ বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি...



সংসদ অধিবেশনে আসছে ১০ বছরের জ্বালানি পরিকল্পনা: প্রধানমন্ত্রী

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধানে আগামী ২৭ তারিখে শুরু হতে যাওয়া সংসদ অধিবেশনে ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা উপস্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা...



আগামীকাল কিশোরগঞ্জে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানী বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

কিশোরগঞ্জে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ অন্যান্য উপাসনালয়ের সেবকদের চলতি অর্থবছরের সম্মানী বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রবিবার (১৬ আগস্ট)...

